OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 306 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 306 - 315
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক নগর জীবন ও দাম্পত্য সম্পর্ক : একুশ শতকের নির্বাচিত দুটি উপন্যাস

জয়ত্রী দত্ত চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: jayatri3151997@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Contemporary Bengali literature, Globalization and society, Marriage and gender relations, Changing marital values, Transformation of moral values, Digital age and relationships, Gender equality, Urban middle-class life, Family structures, Modern social consciousness, Global cultural flows, Women's empowerment, Women's economic independence, Transformation of intimacy.

Abstract

The journey of twenty-first-century Bengali novels continues a long literary tradition while reflecting the profound transformations of contemporary society. In this century, the multifaceted impact of globalization has deeply affected every layer of social and cultural life. Alongside changes in the external world, the inner lives of individuals have also undergone rapid transformation. Human relationships increasingly appear mechanical and fragmented, shaped by the complex, multidimensional networks of the digital age. Just as the internet can instantly connect the entire world, it simultaneously immerses human existence in intricate patterns of tension and contradiction.

Contemporary Bengali writers capture this changing reality through their stories. Their novels explore new social attitudes, work culture, ideas of love, moral and ethical concerns, and the subtle workings of the human mind. These narratives show how modern life brings both challenges and possibilities. Marital and gender relationships, in particular, are no longer fixed. Concepts of marriage, mutual expectations, relational breakdowns, and reconstructions are constantly changing.

Traditionally, women's roles in marriage were mostly limited to household responsibilities and raising children, while men provided economic security. This created male dominance in society. Women had little scope to express their personal desires, largely due to their lack of economic independence. Over time, especially under the influence of globalization, these relationships have undergone significant changes. Marriages once considered lifelong bonds are now renegotiated; women assert their sexual and personal agency, and couples making decisions such as divorce without social hesitation if mutual compatibility is absent.

Understanding how contemporary Bengali fiction represents these transformations requires examining specific works. This study focuses on two selected novels: Pracheta Gupta's 'Dhulo Balir Jibon' and Sukanta Gangopadhyay's 'Tista Jabei'. Both novels reflect the evolving nature of personal relationships, the negotiation of autonomy within partnerships, and

the broader cultural shifts influencing modern love, marriage, and intimacy. Through these narratives, readers gain insight into how twenty-first-century Bengali literature engages with the complexities of marriage, gender roles, and emotional life in an era of rapid social change.

Discussion

ভূমিকা : বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় একুশ শতকের পথচলা। সেই ইতিহাসে দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি আর মানুষের সম্পর্কের অনেক পরিবর্তন ধরা পড়েছে। একুশ শতকে এসে সেই পরিবর্তনটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। কারণ এই শতকের শুরু থেকেই বিশ্বায়ন আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিকে নানাভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশ শতকের শেষ দশকে শুরু হওয়া এই বিশ্বায়নের ঝড়ো হাওয়ায় গোটা পৃথিবী এক নতুন সময়ের মুখোমুখি হয়। বাইরের দুনিয়ার মতো ভেতরের জগতও বদলে গেছে দ্রুত। মানবিক সম্পর্কগুলোতেও এলো পরিবর্তনের ঢেউ। পড়ল অচেনা যান্ত্রিকতার ছাপ। ইন্টারনেট বা অন্তর্জালকে কেন্দ্র করে গোটা পৃথিবী যদিও আজ আমাদের হাতের মুঠোয়, দূরত্ব যেন আর দূরত্ব নয়, তবুও এই একই জাল মানুষের জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জটিল দ্বন্দ্ব আর অচেনা টানাপোড়েনের ভেতর। প্রতিনিয়ত নতুন প্রযুক্তি, নতুন জীবনযাত্রা, কাজের নিত্য নতুন ধরণ— সবকিছুই মিশে গিয়ে বদলে দিচ্ছে মানুষের আবেগ, সম্পর্কের উষ্ণতা আর মানসিকতার সূক্ষ্ম সুর। এই বদলে যাওয়া সময়ের ছবি নানানভাবে ফুটে উঠছে একুশ শতকের উপন্যাসে, যেখানে ধরা পড়ছে সমাজের নতুন ভাবনা, কাজকর্মের নতুন-নতুন ধরণ, প্রেম-ভালোবাসার নতুন ব্যাখ্যা, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের টানাপোড়েন, মূল্যবোধের দোলাচল, এমনকি মানবমনের ভেতরের সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াগুলোও। আজকের দাম্পত্য সম্পর্কও তাই আর পুরোনো দিনের মতো নেই। একসময়ের স্থায়ী এবং একরোখা পুরুষতান্ত্রিক দাম্পত্যের কাঠামো আজ অনেকটাই শিথিল হয়েছে। রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত খুঁজে নিচ্ছে নতুন অর্থ, নতুন সংজ্ঞা। সংসার মানেই আর শুধু আজীবন একসঙ্গে থাকা নয়— এখানে আছে ভাঙনের গল্প, আছে আবার নতুনভাবে গড়ে ওঠার ছবি। ভাঙা-গড়ার এই অনন্ত খেলাই ধরা পড়ে একুশ শতকের উপন্যাসের পাতায়। দাম্পত্যের এই রূপ কতটা এবং কিভাবে উপন্যাসে ধরা পড়ছে, তা বোঝার চেষ্টা আমরা করব দুটো নির্বাচিত উপন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে।

উপন্যাসের মূল আলোচনায় ঢোকার আগে একবার ফিরে দেখা দরকার মানব ইতিহাসের আদিম পর্যায়ে নারী–পুরুষের সম্পর্কটা কেমন ছিল। এই প্রসঙ্গে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এর তাত্ত্বিক ভাবনাকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিবাহ ও পরিবার প্রসঙ্গে অতুল সুর এবং এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক এর ভাবনাও সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

মানব ইতিহাসের আদিম যুগে নারী–পুরুষের সম্পর্ক ছিল অনিয়ন্ত্রিত ও মুক্ত বা বাঁধনহীন। তখন আজকের মতো সংসার, বিবাহ বা দাম্পত্যের বাঁধন ছিল না। ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীতে সবাই মিলে শিকার করত, খাবার জোগাড় করত আর বেঁচে থাকত। এই মানুষদের মধ্যে স্থায়ী দাম্পত্যের ধারণা ছিল না। কে কার সন্তান, সেটা বোঝা যেত না, বা বলা ভালো পিতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা অনিশ্চিত ছিল বলেই সন্তান মায়ের গোষ্ঠীরই অংশ বলে ধরা হতো অর্থাৎ মাতৃত্বকেন্দ্রিক পরিবারই ছিল তখন সমাজের মূল ভিত্তি।

পরবর্তীতে কৃষি ও সম্পদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়ে ওঠে। দীর্ঘ সময় ধরে সন্তান প্রতিপালনের জন্য নারী- পুরুষের স্থায়ী সহবাস প্রয়োজন এবং এভাবেই পরিবারের প্রাথমিক রূপ গড়ে ওঠে এবং বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' (১৮৮৪) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পরিবার কোনো চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় প্রতিষ্ঠান নয়। তিনি মূলত লুইস হেনরি মরগানের 'Ancient Society' (১৮৭৭) এবং জোহান জ্যাকব বাখোফেনের 'Das Mutterrecht' (Mother's Right, ১৮৬১) থেকে ধারণা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। মরগান মানুষের প্রাগৈতিহাসিক জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করেন— বন্যবস্থা, বর্বরতা ও সভ্যতা। অন্যদিকে বাখোফেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বা mother's right এর ধারণা দেন। এই সূত্র ধরে এঙ্গেলস

পরিবারকে অর্থনৈতিক উৎপাদন, সম্পত্তি ও আত্মীয়তার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখান এবং ব্যাখ্যা করেন কীভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবার ও নারীর অবস্থান বদলেছে। মরগানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এঙ্গেলস পরিবারকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করেন, যা আমরা সংক্ষেপে, সূত্রাকারে আলোচনা করতে পারি—

১. **Consanguine Family :** এঙ্গেলস এর মতে এটি পরিবারের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ যেখানে রক্তসম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য হত, অর্থাৎ একই প্রজন্মের পুরুষ ও নারী (siblings) ও তাদের চাচাতো-মামাতো সমপর্যায়ের পুরুষ-নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক বৈধ ছিল, যেখানে একমাত্র নিষেধ ছিল পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের যৌন সম্পর্ক।

২. **Punaluan Family :** ভাই-বোনের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ; শুরু হয় বহির্বিবাহ (Exogamy)।

৩. **Pairing Family :** এক নারী-এক পুরুষের অস্থায়ী সংসার, মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার বজায়।

৪. **Monogamous Family :** একপতি-পত্নী পরিবার, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক। এখানেই নারীর স্বাধীনতা হ্রাস পায় এবং এঙ্গেলস একে বলেন "the world-historic defeat of the female sex."

সভ্যতার যুগে এসে দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। পুরুষের জন্য বহুগামিতা সামাজিকভাবে সহনীয় হলেও নারীর জন্য তা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

সংক্ষেপে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মুক্ত সম্পর্ক থেকে শুরু করে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার, সেখান থেকে ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিক একপতি-পত্নী পরিবার— এই দীর্ঘ যাত্রাপথ মূলত অর্থনীতি, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের নিয়মে পরিচালিত হয়েছে। আর এর ভেতর দিয়েই নারীর অবস্থান ধীরে ধীরে অধীনস্থ হয়ে পড়েছে— যা ছিল এঙ্গেলসের মূল সমালোচনা।

ভারতীয় দার্শনিক অতুল সুরও পরিবার নিয়ে কথা বলেছেন। বিবাহ, পরিবারের উৎপত্তি এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে অতুল সুর তাঁর 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' (১৯৬০) গ্রন্থে বলেছেন, পরিবারের উৎপত্তি প্রথমে হয়েছিল জীবনের প্রয়োজন থেকেই। আদিম যুগে পুরুষ শিকারে গেলে নারী অসহায় হয়ে পড়ত, ফলে তাকে রক্ষা করতে এবং অকারণ সংঘাত এড়াতে বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁর ভাষায় –

> "মনুষ্য সমাজে পরিবারের উদ্ভব হয়েছে জীবজনিত কারণে। বিবাহ দ্বারা পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অনেক পরে এবং এক বিশেষ প্রয়োজনে। আদিম মানুষের পক্ষে খাদ্য আহরণ করা ছিল এক অতি দুরূহ ব্যাপার। পশু মাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য। পশু শিকারের জন্য আদিম মানুষকে প্রায়ই নিজের আশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে যেতে হত। অনেকসময় তাকে একাধিক দিনও দূরে থাকতে হতো। এভাবে পুরুষ যখন দূরে থাকতো তখন তার নারী থাকতো সম্পূর্ণ অসহায় ও রক্ষকহীন অবস্থায়। অপর কোন পুরুষ তাকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গেলে যুদ্ধ ও রক্তপাতের সৃষ্টি হতো। এরূপ রক্তপাত পরিহার করবার জন্যই মনুষ্যসমাজে বিবাহ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।"[১]

উক্ত গ্রন্থে অতুল সুর বৈদিক যুগে প্রাচীন ভারতের বিবাহ প্রসঙ্গও তুলে ধরেন এবং বলেন, বৈদিকযুগে প্রাচীন ভারতে নবপরিণীতা নারীর বিবাহ শুধুই একজন পুরুষের সাথে হতো না বরং তার প্রত্যেক ভাইদের সাথেই হত। এমনকি বেদের বিভিন্ন স্তোত্রে উঠে আসা দেওর এবং বৌদির যৌন ঘনিষ্ঠতার বিষয়গুলোও তুলে ধরেন। অতুল সুরের ভাষায়–

> "বৈদিকযুগের বিবাহ সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, নবপরিণীতার বিবাহ কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হতো না, তার সমস্ত সহোদর ভ্রাতাগণের সঙ্গেই হত। অন্তত আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল। কেননা, আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের সমস্ত ভ্রাতাকে। এজন্য পরবর্তীকালে মনু বিধান দিয়েছিলেন যে, কলিযুগে কন্যার বিবাহ যেন সমগ্র পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে না দেওয়া। ...ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের এক স্তোত্র থেকে বোঝা যায় যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী দেবরের সঙ্গেই স্ত্রীরূপে বাস করতো। ...অথর্ববেদের এক স্তোত্রেও (১০/৩/১-২) অনুরূপ কথা ধ্বনিত হয়েছে। ...ঋগ্বেদে যম-যমীর কথোপকথনে দেখা যায় যে, যমের যমজ-ভগ্নী যমী যখন যমের সঙ্গে যৌনমিলন প্রার্থনা করছে যম

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 306 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> তখন বলছে, 'যেকালে ভাই-বোনে যৌনমিলন ঘটতো সেকাল অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে।' সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে হয়তো এমন যুগ পুনরায় আসবে যখন ভাই-বোনের মধ্যে এরূপ সংসর্গ আবার বৈধ বলে গণ্য হবে। এ ছাড়াও ঋগ্বেদে এরূপ অস্বাভাবিক মিলনের আরও উদাহরণ আছে। যেমন সূর্য ও উষার মিলন।"[২]

অর্থাৎ বৈদিক যুগে এক নারী কেবল স্বামীর নয়, স্বামীর সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখত। আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, কন্যা দান করা হয় গোটা ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে, কোনো একক পুরুষকে নয়। পরে মনুস্মৃতিতে এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। 'দেবর' শব্দের উৎপত্তিই হয়েছে 'দ্বিবর' থেকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বর। বিধবার দেবরের সঙ্গে পুনর্বিবাহ বৈদিক যুগে স্বীকৃত ছিল। ঋগ্বেদে ভাই-বোনের যৌনসম্পর্কের উল্লেখও পাওয়া যায়, যদিও পরে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পরে মহাভারত ও মনুস্মৃতিতে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ পদ্ধতি দেখা যায়—ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ইত্যাদি, যা ধীরে ধীরে আট প্রকারে বিভক্ত হয়।

ফিনল্যান্ডীয় সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক তাঁর The History of Human Marriage গ্রন্থে বলেছেন, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান জন্মের পরও নারী-পুরুষকে একত্রে রাখার প্রয়োজন— যাতে সন্তান লালন-পালন ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ও প্রজননকে নিয়ন্ত্রণ করতে একগামী বিবাহ (Monogamy) চালু হয়। তবে এর মধ্য দিয়েই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তার স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হয়।

এবার নির্দিষ্টভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবর্তন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে, যেখানে দাম্পত্যের অতীত, পরিবর্তন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

সাধারণভাবে আমাদের সমাজে বিবাহ ছিল পারিবারিক সম্মতির ভিত্তিতে স্থাপিত একটি বাধ্যতামূলক ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের রূপ, যেখানে দাম্পত্য সম্পর্ককে দেখা হতো জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন আজীবনের বন্ধন হিসেবে। বিবাহ শুধু দুটি ব্যক্তির নয়, দুটি পরিবারের মিলন হিসেবেও গণ্য হত। সামাজিকতা, কর্তব্যবোধ ও ত্যাগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই সর্ম্পকে বিবাহিত দম্পতি অর্থাৎ নারী-পুরুষের ভূমিকা ছিল স্পষ্টভাবে বিভক্ত পুরুষ উপার্জনকারী, নারী গৃহিণী – এই বিভাজন ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। বিবাহিত জীবনে মানসিক এবং শারীরিক অসন্তোষ থাকলেও বিবাহবিচ্ছেদ ছিল অসম্ভবপ্রায় এবং সামাজিক কলঙ্ক বলে বিবেচিত। সহিষ্ণুতা ও কর্তব্যবোধ ছিল সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার মূল চালিকাশক্তি। অধিকাংশ বিবাহ হত পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেখানে প্রেম বা ব্যক্তিগত পছন্দ ছিল বিরল।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে, বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে শহুরে ও আধা-শহুরে সমাজে বা মফস্বলে দাম্পত্য সম্পর্কে পরিবর্তন দেখা যেতে শুরু করে। এর পেছনে ছিল বিশেষত নারী শিক্ষার প্রসার ও কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, আইনগত সুরক্ষা যেমন স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ইত্যাদি, এবং পরবর্তীতে মিডিয়া, সিনেমা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রেমের ধারণা ইত্যাদি পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে ব্যক্তিকে সম্পর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং দাম্পত্যের ধরণে পরিবর্তন আসতে থাকে। বিবাহ আর কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মানসিক সংযোগের বিষয় হয়ে ওঠে।

বর্তমানে স্বাধীনতা, সমতা ও ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে আমরা দেখতে পাই। একসময় যেখানে বিয়ে ছিল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান – যার ভিত্তি ছিল ধর্মীয় অনুশাসন, পারিবারিক দায়িত্ব, এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা, বিশেষত বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগে সেই ধারণাগুলো ভেঙে পড়ছে। বিয়ে এখন আর বাধ্যতামূলক নয়, বরং শুধু একটি সম্ভাবনাই মাত্র, যার মধ্যে না প্রবেশ করাও একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। সম্পর্ক আর আগের মতো ত্যাগ বা কর্তব্যের উপর নির্ভর করে না, বর্তমানে সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মান ও মানসিক বোঝাপড়ার উপর, সমান অধিকারের প্রেক্ষিত থেকে পেশাগত জীবনের গুরুত্ব এবং ব্যক্তি পরিসরের ওপর নির্ভরশীল। এখন নারী-পুরুষ উভয়েই উপার্জনকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। নারীরা যেখানে অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল নয়, সেখানে "বেঁচে থাকার জন্য বিবাহ টিকিয়ে রাখতে হবে" – এই ধারণা আর প্রাসঙ্গিক নয়। এমনকি নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা পিতৃতান্ত্রিক বিবাহ কাঠামোকে 'চ্যালেঞ্জ' জানাচ্ছে। নারী বা পুরুষ কারো একচ্ছত্র আধিপত্যকে সহজে মেনে নেওয়া হয় না। তাছাড়া প্রযুক্তির প্রভাব ও গ্লোবাল সংস্কৃতি প্রসারের ফলে

সোশ্যাল মিডিয়া, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যেমন Netflix, Amazon Prime, ইত্যাদিতে দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন ধারণা তৈরি করা হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারাকে অনুকরণ করে প্রতিনিয়ত ভারতীয়দের মধ্যেও দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের 'ডেটিং কালচার' এখন অনেকটাই ভারতের শহুরে সমাজে স্থান করে নিয়েছে। বর্তমানে সন্তান ধারনের অনীহা, বিবাহ বিচ্ছেদ, 'সিঙ্গল প্যারেন্টহুড', কিংবা 'লিভ-ইন' সম্পর্ক এগুলো সামাজিকভাবে আগের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও আইনি সুরক্ষায় সুরক্ষিত। এছাড়াও, পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই গড় বিবাহের বয়স বেড়ে গেছে, বিয়ের সংখ্যা কমেছে, এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বা বিবাহ না করেই সন্তান ধারণ – এসব এখন আর বিরল নয়, বরং গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। কারণ মানুষ এখন আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, বিবাহ সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

অর্থাৎ আজকের সমাজে বিশেষ করে মেট্রোপলিটন শহরে দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, যেখানে একেকজনের কাছে সম্পর্কের সংজ্ঞা আলাদা। কেউ বিয়ে করে একসাথে থাকার অর্থ খোঁজে, কেউ আবার একই ঘরে থেকে 'ওপেন ম্যারেজ'-এ বিশ্বাস করে। কেউ বলে, 'বিয়ে মানে ভালোবাসা নয়', কেউ আবার 'লিভ টুগেদার'-এ পায় মানসিক স্থিতি। আজকের সম্পর্কে 'আমি কে?', 'আমি কি চাই' – এই প্রশ্নগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নির্বাচিত দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা এই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করব।

ধুলোবালির জীবন (২০১৯) : একুশ শতকের ঔপন্যাসিক প্রচেত গুপ্তের 'ধুলোবালির জীবন' (২০১৯) উপন্যাস অবলম্বনে দেখা যায়, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়ে ওঠা শ্রীজিতা ছেলেবেলা থেকেই বাবার কঠোর নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ ছিল। তার বাবা অনিমেষ বসু মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েও আসলে কখনোই চাননি যে মেয়ে কেরিয়ার গড়ুক। বরং মনে করতেন, ভালো পাত্র দেখে তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারের গণ্ডিতে আটকে দিতে হবে যাতে মেয়ে কোনো ভুল পদক্ষেপ না নিয়ে নেয়। অনিমেষ বসুর কাছে মেয়ের জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল তাঁর নিজের হাতে। এমনকি মেয়ের কলেজে ভর্তি হওয়া, কার সঙ্গে পড়াশোনা করবে, কাকে বিয়ে করবে- সবই তিনি নির্ধারণ করতেন। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় মেয়ে ভালো রেজাল্ট করলেও তাকে নিজের পছন্দ মতো নামী কলেজে ভর্তি হতে দেননি অনিমেষ, কারণ কোএডুকেশন। ছেলেদের সঙ্গে মেয়ে পড়বে, এটা তিনি মানতে পারেননি। তাই কলকাতার ভালো মেয়েদের কলেজেই শ্রীজিতাকে ভর্তি করাতে চান তিনি। আসলে সংসারের সব ছোট বড় সিদ্ধান্তেই অনিমেষ বসুর কথাই চূড়ান্ত। রক্ষণশীল মানসিকতায় পুষ্ট শ্রীজাতার মা জয়াও স্বামীর দাপটের উপর চিরকালই আস্থাশীল। তিনি মনে করেন দাপুটে মানুষ সংসারের জন্য ভালো। কিন্তু শ্রীজিতা সেই মান্ধাতা আমলের চিন্তাধারা মেনে নেয়নি। সে পড়তে চেয়েছিল, চেয়েছিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে। সে বুঝেছিল, তার নিজেরও স্বপ্ন আছে, নিজের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার অধিকার আছে। তাই পরিবারের অমতে, এমনকি পরিবারের সাথে সব সম্পর্ক ভেঙে বিধানকে বিয়ে করেছিল। না, সুখের প্রত্যাশায় নয়, বরং এই বিশ্বাসে যে, বিধানের সঙ্গে সংসার করতে গেলে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে ঠিকই, কিন্তু অন্তত বিধান তাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেবে। তার ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে বাঁধা হবে না। উপন্যাসে আমরা দেখি, সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজের কাজের জায়গায় দাঁড়াতে শ্রীজিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রান্না করার জন্য বাইরের লোক রাখা নিয়ে বিধান আপত্তি করলে শ্রীজিতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়-

> "আমি সারাদিন হেঁসেলে থাকব এরকম কোনো চুক্তি কি তোমার সঙ্গে হয়েছিল? ...তুমি বরং রান্না শিখে নাও, আমি আমার কাজে আরও বেশি করে মন দেব বিধান। আমি কেরিয়ারে মন দেব। আমার খুব ইচ্ছে, বাইরে কোথাও গিয়ে মার্কেটিং-এর উপর ডিগ্রি নিয়ে আসি। আমাদের অফিসে এই বিষয়ে অনেকের ডিগ্রি আছে। মাঝে-মাঝে নিজেকে ইনফিরিয়র লাগে। রান্নাঘরের উচ্ছে, বেগুনে আমার আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"[৩]

এই দৃষ্টান্ত আসলে সমাজের একধরনের বড় পরিবর্তনের প্রতিফলন। এখানে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, আধুনিক নারীরা আর শুধুমাত্র গৃহকর্মের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না। সংসারের কাজ এখন নারী-পুরুষ উভয়েরই

দায়িত্ব। আজকের মেয়েরা আর শুধু তথাকথিত ভালো বিয়ে, সংসার আর সন্তানকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে দেখছে না। ফলে বলা যায় বিশ্বায়ন শুধু অর্থনীতির নয়, সম্পর্ক ও সামাজিক কাঠামোরও নতুন পথ খুলে দিয়েছে। নারীরা যেমন আজ ক্যারিয়ার, শিক্ষা ও স্বাধীনতার স্বপ্নে এগোচ্ছে, তেমনই পুরুষদেরও সংসার ও সন্তানের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হচ্ছে। তাছাড়া মেয়েদের জন্য বিয়ে মানেই পরিবারের এককেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত-যেখানে তারা নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ পেত না, শুধু পরিবারের নির্বাচিত পাত্রকেই বিয়ে করতে বাধ্য হতো। কিন্তু আজকের মেয়েদের শুধুমাত্রই ‘মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়ার’ জায়গায় আর আটকে থাকতে হচ্ছে না, এই নিষেধের জায়গা ভেঙে তারা বেরিয়ে আসছে এবং দাম্পত্য সম্পর্কেও এক ধরনের সমতা, পারস্পরিক বোঝাপড়ার নতুন পরিসর তৈরি হচ্ছে।

উপন্যাসে অন্যদিকে দেখা যায়, রাতে শোওয়ার পর যৌন মিলনের ক্ষেত্রে প্রায়ই শ্রীজিতা নিজেই প্রথম উদ্যোগ নিত। বিধানকে টেনে নিত নিজের কাছে। বেশিরভাগ দিনই জোর করত। কিন্তু সেই টানাপোড়েনে সাড়া মিলত না বিধানের দিক থেকে। এতে তার ভেতরে জমে থাকা অস্থিরতা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠত। কখনও এমনও হত, অনেকটা চাপা ক্ষোভ আর অপূর্ণতার বেদনা থেকে শ্রীজিতা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে উঠত। একসময় নিজের ভিতরের সমস্ত লজ্জা সরিয়ে রেখে বিছানার উপর উঠে পড়ত। নাইটি এক ঝটকায় খুলে ফেলে, নগ্ন শরীরটাকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরত বিধানের চোখের সামনে। দু'হাত ছড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিত -

> “এবার বলো, এবার আমার এই শরীরটা পেতে ইচ্ছে করছে না তোমার? আমার বুক দুটো দেখো। আমার পেট দেখো, কোমর দেখো, দেখো আমার এই পা দুটো। ভালো নয়? মনে হয় না কেড়ে নেই?”[৪]

তার ভেতরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন ভাষার থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠত। কখনও মিলনের মুহূর্তে শ্রীজিতা নানা ভঙ্গিমায় স্বামীকে আগ্রহী করার চেষ্টা করত। কিন্তু বিধানের সব ক্ষেত্রে উদাসীন মনোভাব এখানেও অনীহার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

এখানে আমরা দেখতে পারি, শ্রীজিতা তার যৌন আকাঙ্ক্ষাকে গোপন না রেখে সরাসরি প্রকাশ করছে। আগে যেখানে নারীর পক্ষে এই ধরনের চাহিদা ব্যক্ত করা ‘অশোভন’ বা ‘ট্যাবু’ ছিল, বিশ্বায়নের প্রভাবে আজ একুশ শতকের নারীরা সেই বাঁধা ভাঙছে। গ্লোবাল মিডিয়া, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, ইত্যাদি অবশ্যই নারী-পুরুষ সম্পর্কের নতুন ধারণা আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত তুলে ধরছে - যেখানে নারীও নিজের শারীরিক ইচ্ছাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে। আগে যে যৌন সম্পর্ককে শুধুমাত্র পুরুষই নিয়ন্ত্রণ করত, এখানে দেখা যাচ্ছে, নারী নিজের আকাঙ্ক্ষার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ শুধু দাবি করছে না, নানানভাবে যৌনমিলনের প্রেক্ষাপট তৈরির চেষ্টাও করছে। ফলে আমরা দেখতে পাই একুশ শতকের নারীরা নিজের দেহ, ইচ্ছা ও অনুভূতিকে শুধু প্রকাশই করছে এমন নয়, সেই প্রসঙ্গে নেতৃত্বও গ্রহণ করছে।

নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দাম্পত্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনেছে। প্রচেত গুপ্তের ‘ধুলোবালির জীবন’ উপন্যাসে আমরা নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। উপন্যাস অবলম্বনে দেখা যায় ডিভোর্সের প্রসঙ্গ প্রথমে শ্রীজিতাই টেনে আনছে, শান্তভাবে। কিন্তু ক্রমে সম্পর্কের ভেতরে উত্তেজনা ও তীব্রতা বাড়তে থাকে। একদিন রাতে অফিসের কাজের চাপে সে বাড়ি ফেরেনি। বিধান যখন ছোট্ট মেয়ের হঠাৎ কান্নার কথা ফোনে জানায়, শ্রীজিতা প্রত্যুত্তরে বলে -

> “কী করব আমি? অফিসের কাজ ফেলে দিয়ে মেয়ের কান্না থামাতে বাড়ি চলে যাব? কোলে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে, গান গেয়ে তার কান্না থামাব? ...মেয়ের কান্না থামানোর দায়িত্ব শুধু আমার নয়। তোমারও।”[৫]

এখানে সন্তান প্রতিপালনে যৌথ দায়িত্ব নেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে আসছে। আগে সন্তান প্রতিপালনকে সমাজ শুধুমাত্র নারীর দায়িত্ব বলেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু উপন্যাসে শ্রীজিতার এই উক্তি আমাদের জানান দেয় আজকের দিনে পুরুষও ধীরে ধীরে প্যারেন্টিংয়ের সক্রিয় ভূমিকা নিতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে, শ্রীজিতা বিধানকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে - ক্যারিয়ারই এখন তার জীবনের সবকিছু। বাইরে কোথাও গিয়ে মার্কেটিং এর উপর ডিগ্রী নিয়ে আসতে চায় সে, কারণ এ বিষয়ে তার অফিসের অনেকের ডিগ্রী আছে। ফলে, নিজেকে মাঝে মাঝে ‘ইনফিরিয়র’ লাগে। রান্নাঘরের উচ্ছে, বেগুনে তার আর কোনো ‘ইন্টারেস্ট’ নেই। বিধান যাতে রান্না শিখে নেয়। বিধানের প্রতি তার অভিযোগ, সে স্ত্রীর প্রতিভা ও যোগ্যতাকে মূল্য দেয়নি, বরং সবসময়ই নির্লিপ্ত থেকেছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 306 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এমনকি বিধানকে সে বিয়েও করেছিল তার ক্যারিয়ারে কোন সমস্যা বিধান করবে না ভেবেই। বিধানের সব ব্যাপারেই ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ত মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়ে শ্রীজিতা বলে -

> "মন দিয়ে শুনে রাখো, আমি আমার মতো চলতে শুরু করেছি। সে চলা আমি কিছুতেই আর থামাব না। সেই পথে কোন পুরুষ আমার শরীর স্পর্শ করল, আমি কোন পুরুষের বিছানায় গেলাম, তাই নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই। যে তার স্ত্রীর যোগ্যতা নিয়ে উদাসীন, তার শরীরের শুদ্ধতা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনও অধিকার তার নেই। তোমার এই ভিখিরির সংসার আমার জন্য নয়। ভেবেছিলাম বিয়ের পর বদলাবে। ভুল ভেবেছিলাম। আমি আমার কেরিয়ার তৈরি করব। আমার মেয়েকে বড় করব। সেখানে তোমার কোনও ভূমিকা থাকবে না। বাধা দিতে এলে সংঘাত হবে'। শ্রীজিতা বিধানকে ডিভোর্স দিতে চায় এবং উকিলের সঙ্গে নিজেই কথা বলে।"[৬]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শ্রীজিতা যেহেতু একটি কোম্পানিতে ভালো বেতনের চাকরি করে, ফলে সে আর আর্থিকভাবে বিধানের উপর নির্ভরশীল নয়। সে বুঝতে পেরেছে যে তার নিজের আয় আছে, ফলে সংসার ভাঙলেও তার বেঁচে থাকার জন্য বিধানের প্রয়োজন নেই। তাই সে দৃঢ়ভাবে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এমনকি নিজের টাকায় ফ্ল্যাট কিনে এবং মেয়ে তোয়াকে একাই বড় করে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। আর তোয়ার বড় হওয়াটা যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা বা বলা ভালো মধ্যবিত্ত সাদামাটা জীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে না সেটা বিধানকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতেও দেখা যায় উপন্যাসে —

> "...আমি মেয়েকে আমার মতো করে মানুষ করব। ওর ধ্যান-ধারণা, জীবন বিশ্বাস যেন আমার মতো হয়। বদ্ধ এঁদো পানা পুকুরের মতো জীবন ও বহন করবে না। কনভেন্টে পড়বে, হস্টেলে থাকবে, বিদেশে যাবে। সে তার বাবার মিডিওকার জীবন চিনবে না। সে যেমন লেখাপড়া করবে, তেমন বন্ধুবান্ধব, পার্টি চিনবে। তোয়াকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"[৭]

আগে বিয়ে মানেই আজীবনের বন্ধন এবং স্বামীর উপরই নির্ভরশীল থাকায় শুধুমাত্র ঘর, বর এবং সংসারের চেনা ছকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল মেয়েরা। অন্যদিকে, বিবাহিত নারীর জন্য রাতে বাড়ি না ফেরা এবং সন্তানকে স্বামীর হাতে রেখে দেওয়া অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে মেয়েদের প্রবেশ এই চিত্রকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকা থেকে সরে এসে তারা এখন সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিচ্ছে নিজের ক্যারিয়ারকে, প্রত্যেকেই নিজের স্বপ্ন ও সাফল্যের পথে এগোতে চাইছে। আজকের দিনে যদি সম্পর্ক বা বিবাহ নারীর স্বাধীনতা ও পেশাগত দিক থেকে এগোনোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা সহজেই ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং নিজের মতো করে জীবন গড়ার সাহস দেখাচ্ছে। অর্থাৎ দাম্পত্য আর এককেন্দ্রিক নির্ভরশীলতার জায়গা নয়, বরং সমান মর্যাদা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জায়গা হয়ে উঠছে। এর ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরে ক্ষমতার ভারসাম্যও পাল্টে যাচ্ছে।

যৌনতার ধারণা এখানেও পাল্টাতে দেখা যাচ্ছে। ক্যারিয়ারের স্বার্থে শ্রীজিতাকে একাধিক পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়ানোর কথাও উপন্যাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং সেটা লুকিয়েও নয়, শ্রীজিতা সরাসরি বিধানকে বলে দিয়েছে যে, কোন পুরুষ তার শরীর স্পর্শ করল, সে কোন পুরুষের বিছানায় গেল, তা নিয়ে বিধানের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এমনকি সে জানাচ্ছে, ভবিষ্যতে তার জীবনে অন্য পুরুষ আসলেও সেটাকে সে গোপন করবে না- কারণ সে নিজেকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। শ্রীজিতা বিধানকে ঠান্ডা গলায় জানিয়ে দেয় যে তার শরীর বা তার যৌন জীবনের উপর বিধানের কোনও অধিকার নেই। আগে নারী-শরীরকে স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে ধরা হত, কিন্তু এখন নারী তার শরীরের উপর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দাবি করছে। এটাও বিশ্বায়ন পরবর্তী মুক্তচিন্তার বড় প্রভাব।

এভাবেই নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দাম্পত্যের কাঠামোতে নতুন রূপ এনে দিয়েছে, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ক্যারিয়ার প্রাধান্য সম্পর্কের স্থায়ীত্বের থেকে অনেক সময় বড় হয়ে উঠছে। এবং ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য এই যুগে নারীর এই নতুন অবস্থানই দাম্পত্যে ডিভোর্সের প্রবণতাকে আরো 'স্বাভাবিক' করে তুলেছে। যার উদাহরণ আমরা একাধিক উপন্যাসে পাই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 35
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 306 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিস্তা যাবেই (২০০২) : সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘তিস্তা যাবেই’ (২০০২) উপন্যাসে আমরা দেখি, তিস্তার বাবার এক ছাত্র যোগব্রত, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং কাজের সূত্রে লন্ডনে থাকে। প্রায় দশ বছরে এক-দু'বার মাত্র দেশে আসে। যোগব্রত বিয়ে করেছিল মার্থাকে। কিন্তু তাদের ছ'মাসের দাম্পত্য জীবনে যোগব্রত সংসারের কোনো উষ্ণতা খুঁজে পায়নি। মার্থা বেলা করে ঘুম থেকে উঠে অফিসে যেত, রাত করে ক্লাব থেকে ফিরত মদ্যপ অবস্থায়। যোগব্রতকেই তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে হত। অথচ বিয়ের জন্য তাড়া দিয়েছিল মার্থাই। বিয়ের পর থেকেই মার্থা নিজের মতো জীবন যাপন করত, পরিবার গড়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। লেখক এর ভাষায় -

> “মার্থার সঙ্গে ছ'মাসের বৈবাহিক জীবনে সে আর যাই হোক, সংসারের সুবাস পায়নি। বেলা করে ঘুম থেকে উঠে মার্থা অফিসে চলে যেত। ফিরত ক্লাব ঘুরে মাঝরাতে। পুরো ড্রাঙ্ক। বিছানায় শুইয়ে দিতে হত যোগব্রতকে। বিবাহিত জীবনকে ঘেন্না করত মার্থা। অথচ বিয়ের জন্য তাড়া দিয়েছিল ও-ই।”[৮]

বস্তুত, কাজের সূত্রে লন্ডনে থাকাকালীন প্রেম করে বিয়ে করেছিল যোগব্রত - মার্থা। অন্যদিকে, মার্থা ভারতীয়দের পারিবারিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই অবগত ছিল। নিউজার্সিতে তাদের বাড়ির পাশের এক ভারতীয় পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে বড় হতে গিয়ে সে ভারতীয় পারিবারিক বাঁধনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিল। সেই অভিজ্ঞতার ঋণ শোধ করতেই যেন যোগব্রতকে বিয়ে করেছিল সে। তবু পরিবার গড়ার তেমন উৎসাহ ছিল না মার্থার মধ্যে। মুক্তির খোঁজে থাকলেও প্রতিদিন রাতে সে বাড়ি ফিরত। তাহলে কি শুধু 'বিয়ের কাগজটাই' ছিল তাদের একমাত্র বন্ধন? অবশেষে, ডিভোর্স ফর্ম এনে যোগব্রতকেও সে সেই মুক্তির পথে ঠেলে দিল।

আবার, কর্পোরেট জীবনের তীব্র চাপ আজ নারী-পুরুষ উভয়কেই গ্রাস করতেও দেখা যাচ্ছে। সন্তানকে প্রয়োজনীয় সময়টুকু তারা দিতে পারছেন না, যার ফলে পারিবারিক সম্পর্কে মানসিক দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। ‘তিস্তা যাবেই’ উপন্যাসে যোগব্রতের চোখ দিয়ে আমরা এই সংকটটিকেই দেখতে পাই। চাকরি সূত্রে প্রথম কয়েক বছর নিউইয়র্কে থাকাকালীন সে দেখেছে অমিয়দা-শিলাদির সংসারকে। কলকাতায় থাকাকালীন যাদের সংসার প্রাণবন্ত মনে হতো, দশ বছর পর আমেরিকায় গিয়ে যোগব্রত দেখল তাদের অবস্থা একেবারেই বদলে গেছে।

প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে অমিয়দা প্রায় বেকার হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে শিলাদি একটি ব্যাংকে চাকরি করছেন। তাদের একমাত্র ছেলে ড্রাগ-আসক্ত হয়ে পড়েছে, বাড়ি ফেরে না বেশিরভাগ দিনই। হতাশায় ডুবে থাকা অমিয়দাকে দেখা যেত মদের বোতল নিয়ে টয়লেটে বসে থাকতে। যোগব্রতের মনে হত, যদি তারা নিজেদের দেশে, পরিজনদের বেষ্টিত থেকে জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিতে পারত, তবে হয়তো পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হতো না। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, বিশ্বায়নের ফলে ‘উন্নত ক্যারিয়ার’ এর মোহে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া অনেক পরিবার এভাবেই ভেঙে যাচ্ছে। অমিয়দা-শিলাদির মতো দম্পতিরা অর্থনৈতিক সাফল্য পেলেও হারাচ্ছেন পারিবারিক উষ্ণতা, সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং নিজেদের মানসিক শান্তি।

বিশ্বায়নকে কেন্দ্র করে একুশ শতক তাই কেবল কর্মজীবনের সুযোগই এনে দেয়নি, বরং সম্পর্কের ভেতরে ভাঙন এবং একাকীত্বের গভীর ছাপ ফেলতেও দেখা যাচ্ছে।

উপন্যাসে আমরা আরেকটি দাম্পত্য সম্পর্কের মুখোমুখি হই— যোগব্রতের জেঠতুতো ভাই দীপু ও তার স্ত্রী মণিদীপার। দীপুর স্বভাব রাতারাতি বড়লোক হওয়ার, এবং সেই উদ্দেশ্যেই সে চায় যোগব্রত যাতে নিজের জমি প্রমোটারের হাতে ছেড়ে দেয় এবং পার্টনারশিপে সে সার কারখানা করতে পারে। এজন্য দীপু নিজের স্ত্রী মণিদীপাকে দায়িত্ব দেয় যোগব্রতকে রাজি করানোর।

মণিদীপা রাতে যোগব্রতের ঘরে আসে, বিছানা করে দেওয়ার অজুহাতে। তার পোশাকে চোখ আটকে যায় যোগব্রতের— পাতলা স্লিভলেস নাইটির ভেতর দিয়ে আলোর বিপরীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অন্তর্বাস। মণিদীপা জানায়, দিপু সেদিন রাতে বাড়ি ফিরবে না এবং বাড়ির সকলে ঘুমিয়েও পড়েছে। যোগব্রত তার উদ্দেশ্য বুঝে নকল হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে, কিন্তু লাভ হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের আলো নিভে যায়, দরজা বন্ধ হয়, আর মণিদীপা

সরাসরি শরীর দিয়ে আকর্ষণ করতে থাকে যোগব্রতকে। যখন যোগব্রত বলে যে এটা অন্যায়, অনাচার— মণিদীপা তখন গর্জে ওঠে বলে –

> “কিসের অন্যায় শুনি? আমি শুধু আদেশ পালন করছি। আপনার জমিটা প্রমোটারকে দিয়ে দিন। ওর টাকার খুব দরকার ... বলে গেছে যে করে হোক আপনাকে রাজি করাতে হবে। তার মানে কি আমি আপনার হাতে পায়ে ধরব! আমি আমার মতো করে রাজি করাব আপনাকে, যাতে আমারও সুখ হয়। তাতেও যদি রাজি না হন আপনি, আমার কিছু যায় আসে না। হয়তো সে আমাকে মারবে ধরবে, সুখটা তো ভুলিয়ে দিতে পারবে না।”[৯]

যোগব্রত স্তব্ধ হয়ে ভাবে, মার্থার সঙ্গে মণিদীপার কোনো পার্থক্য নেই— দু'জনেই তাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে দেখে। মণিদীপা আরও বলে, রাতের পর রাত যার স্বামী বাড়ি ফেরে না, সে একটু অনাচার করতেই পারে। দীপুর নামে নানা নারীসংক্রান্ত কেচ্ছাও নাকি ছড়িয়ে রয়েছে।

দাম্পত্য জীবনে বরাবরই দেখা গেছে যে, স্বামী যদি অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ত, সেটাকে সমাজ অনেকটা স্বাভাবিক ভেবে নিত, আর স্ত্রীদের সে অন্যায় নির্বিবাদে সহ্য করতে হত। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াত, তবে তা হত পাপ, কলঙ্ক, অনাচার। মণিদীপা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই প্রথাগত ধারণার ভাঙন দেখতে পাই। স্বামী দিপুর স্বার্থসিদ্ধির জন্য যোগব্রতকে প্রভাবিত করাই মণিদীপার উদ্দেশ্য হলেও, তার ভেতরে শারীরিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশও ঘটে। সে স্পষ্ট জানায়, স্বামী যখন রাতের পর রাত বাইরে থাকে, তখন স্ত্রীও নিজের মতো করে দাবি তুলতেই পারে।

এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একুশ শতকের দাম্পত্যে আমরা দেখি— স্ত্রীর নীরব সহনশীলতা আর আত্মত্যাগের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও নিজের অস্তিত্বের দাবি-দাওয়া। ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক এখানে কেবল সামাজিক নিয়মে বাঁধা নয়, বরং ব্যক্তিস্বাধীনতা, আকাঙ্ক্ষা ও ভিন্নতর নৈতিকতার এক নতুন বাস্তবতা। একসময় যে দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক আস্থা, সামাজিক নিয়ম, এবং পারিবারিক বন্ধন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে একধরনের সামাজিক চুক্তি বা নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হত, স্ত্রীকে স্বামীর পরিপূরক এবং সংসারের রক্ষক হিসেবে ভাবা হত, যেখানে তার ভূমিকা ছিল আত্মত্যাগমুখী, সেই দাম্পত্যের চিত্র আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে পাল্টে গেছে। এখানে মণিদীপার আচরণ দীপুর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে প্রকাশ পেলেও সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে মণিদীপার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা দাম্পত্য জীবনের এক ভিন্ন বাস্তবতা দেখতে পাই। এখানে স্বার্থপরতা ও ব্যবহারিকতা দাম্পত্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়। স্ত্রী এখানে স্বামীর প্রতিনিধি হয়ে নিজের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে যেখানে শারীরিকতা ও যৌন আকর্ষণ কেবল ভালোবাসার প্রকাশ নয়, বরং দরকষাকষি ও কৌশলের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। দাম্পত্যে অসন্তুষ্টি ও একাকীত্বকেও আমরা এখানে দেখতে পাই। মণিদীপার স্বামী দীপু রাতের পর রাত বাড়ি ফেরে না, বিভিন্ন মেয়ে নিয়েও নানান কুৎসা শোনা যায়। এর ফলে স্ত্রী নিজেকে ন্যায্যতা দিচ্ছে তথাকথিত সামাজিক ‘অনাচার’-এর মাধ্যমে। নৈতিকতার প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে আমরা বলতে পারি এখানে সম্পর্ক আর নীতির ওপর নয়, বরং ব্যক্তিগত সুখ, স্বার্থসিদ্ধি আর তাৎক্ষণিক সুযোগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

অতএব, এই একুশ শতকের দাম্পত্যে আমরা ভিন্ন বাস্তবতা দেখতে পাই— যেখানে একদিকে আস্থা ভেঙে গিয়ে তার জায়গা নিয়েছে স্বার্থ, প্রতিযোগিতা আর মানসিক দূরত্ব। অন্যদিকে, স্ত্রী আর কেবল আত্মবলিদানের প্রতীক নয়, বরং নিজের দমে নিজের অবস্থান তৈরির চেষ্টা করছে— যদি তা সামাজিক নীতি ভেঙে হয়, হোক।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি, একুশ শতকের উপন্যাসে প্রতিফলিত আধুনিক নগর জীবনের দাম্পত্য সম্পর্ক আমাদের চোখে আনে এক গভীর পরিবর্তনের ছবি। ঔপনিবেশিক যুগের শেষ থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত (১৯শ শতকের শেষভাগ থেকে ২০শ শতকের শেষভাগ) অর্থাৎ প্রায় উনিশ শতক ও বিশ শতকের অধিকাংশ সময় পর্যন্ত ‘দাম্পত্য’ মানেই ছিল মূলত সংসারকেন্দ্রিক এক জীবন, যেখানে— নারীকে দেখা হত পরিবার রক্ষাকারী, সন্তান জন্মদাত্রী ও স্বামীনির্ভর সত্তা হিসেবে। পুরুষ ছিলেন পরিবারের উপার্জনকারী ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী।

দাম্পত্যে সম্পর্কের মূল ভিত্তি ছিল সামাজিক নিয়ম, ধর্মীয় বিধান ও পারিবারিক চাপে টিকে থাকা, ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা স্বাধীনতার চেয়ে। স্বামী বাইরে অন্য সম্পর্কে জড়ালেও সমাজে তা তেমন বড় দোষ মনে করা হত না; অথচ স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন সম্পর্ক ছিল অকল্পনীয় ও কলঙ্কস্বরূপ। ফলে স্ত্রীর ভূমিকা ছিল সহ্যশীল, আত্মবলিদানমুখী ও নীরব। কিন্তু বিশ্বায়ন-পরবর্তী একুশ শতকের আধুনিক নগরজীবনে সেই দৃশ্যপট ভেঙে এক নতুন বাস্তবতা গড়ে উঠেছে। নারী আজ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর এবং এই স্বনির্ভরতা তাকে এনে দিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা, ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বরূপ – যেখানে সে আর কেবল সহ্যশীল নয়। সে শুধু সংসারের অন্দরমহলে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমানতালে বাইরে কাজ করছে, নিজের ক্যারিয়ার গড়ছে এবং নিজের চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সমস্তকিছুর প্রকাশ ঘটাতে শুরু করেছে। অর্থাৎ, দাম্পত্য আর নিছক সহিষ্ণুতার খাঁচায় আবদ্ধ নেই, বরং নারীও আজ প্রতিবাদী, নিজের স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়। যৌনতার ক্ষেত্রেও এসেছে মুক্তির সুর— যেখানে আগে পুরুষই ছিল নিয়ন্ত্রক, আজ সেখানে নারীরাও নিজেদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে, এমনকি কখনো স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবেও শরীরকে ব্যবহার করছে। আজকের দাম্পত্য কেবল সংসারের চৌহদ্দি বা সমাজের বাঁধনে আবদ্ধ নয়, নয় জন্মজন্মান্তরের শপথে বাঁধা কোনো অনড় প্রতিষ্ঠানও। এখানে দু'জন মানুষ সমানতালে হাঁটার চেষ্টা করে, কখনো ছন্দ মিলে যায়, কখনো তাল কাটে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি পরস্পরের সঙ্গে ভালো না থাকে, তবে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে তারা দ্বিধা করছে না। আবার নতুন সম্পর্কেও জড়ায়।

আলোচনায় দেখা যাচ্ছে একুশ শতকের উপন্যাস আমাদের সামনে তুলে ধরে দাম্পত্যের এক নতুন ভাষা— যেখানে সহনশীলতার পরিবর্তে এসেছে প্রতিবাদ, নীরবতার পরিবর্তে এসেছে উচ্চারণ, আর কলঙ্কের ভয় ভেঙে নারী নিজেকে প্রকাশ করছে তার নিজস্ব রূপে। ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক আজকের উপন্যাসে প্রতিফলিত হচ্ছে এক নতুন সময়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে — যেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া, স্বাধীনতা, প্রতিবাদ, আকাঙ্ক্ষা ও ভাঙনের মিশ্রণে গড়ে উঠছে একুশ শতকের আধুনিক নগরজীবনের দাম্পত্য বাস্তবতা।

Reference:

১. সুর, অতুল, *'ভারতের বিবাহের ইতিহাস',* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ১১
২. তদেব, পৃ. ২৩-২৪
৩. গুপ্ত, প্রচেত. *'ধুলোবালির জীবন',* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১
৪. তদেব, পৃ. ৮০
৫. তদেব, পৃ. ১১৩
৬. তদেব, পৃ. ১১৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৫
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত. *'তিস্তা যাবেই',* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৫৫
৯. তদেব, পৃ. ৭১